সম্প্রচার নীতিমালা, আইন ও কমিশন

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর

সরকার ঘোষিত জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ইতোমধ্যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। নীতিমালা রচয়িতারা ছাড়া আর কেউ এই নীতিমালার সমর্থনে এগিয়ে আসেনি। এমনকি সাংবাদিকদের মধ্যে যে আওয়ামী গ্রুপ রয়েছে তারাও এর সমালোচনায় মুখর। সরকার আশা করেছিল এই নীতিমালা দিয়ে স্বাধীন সম্প্রচার মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করবে। কিন্তু প্রথম স্তরেই তা বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

দেশের অনেকেই মনে করেন, সম্প্রচার মাধ্যমকে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে আনার জন্যে সরকার এই নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। আমার মনে হয়, এই ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। এর পেছনে সরকারের একটা রাজনৈতিক নীলনকশাও রয়েছে। ৫ জানুয়ারির প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের পর সরকার অনেকটা অস্বস্তিতে আছে। প্রায় বিনা নির্বাচনের জাতীয় সংসদ নিয়েও সরকার অস্বস্তিতে। দেশে তো বটেই, বিদেশেও অনেক বন্ধুরাষ্ট্র ৫ জানুয়ারির প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছে। সরকার নানা রাজনৈতিক কৌশলে ও মামলার জাল দিয়ে দেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপিকে কোনঠাসা করে রাখতে সক্ষম হয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর নেতারা যুদ্ধাপরাধের মামলায় কাবু হয়ে গেছে। রাজনৈতিক কৌশলে জাতীয় পার্টিকেও সরকার প্রায় ভোঁতা করে দিয়েছে। বাস্তব অর্থে রাজনৈতিক অঙ্গনে এই সরকারের কার্যকর বিরোধিতা করার মতো এখন আর পরিবেশ নেই। সরকারের যাবতীয় কুকীর্তি নিয়ে এখন সমালোচনা মুখর একমাত্র গণমাধ্যম। টেলিভিশনের 'সংবাদ' ও 'টক শোতে' সরকারকে প্রায় প্রতিদিন তুলোধুনা করা হচ্ছে। সরকারি ও তাদের দলীয় লোকজন এমন এমন কুকর্ম করছেন যা টিভিতে প্রতিদিনই প্রায় উন্মোচিত হচ্ছে। কয়েকটি প্রভাবশালী স্বাধীন সংবাদপত্রও সরকারের ব্যর্থতা প্রতিদিন তুলে ধরছে। এর সঙ্গে রয়েছে কয়েকটি সক্রিয় নাগরিক ফোরাম। প্রধান বিরোধী দলকে সরকার নানা কৌশলে কোনঠাসা করতে পারলেও গণমাধ্যমকে বশে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। আর কয়েকটি নাগরিক ফোরামও সরকারের বশংবদ হতে রাজি হয়নি। এরাই এখন সরকারের তথাকথিত 'স্বপ্ন' বাস্তবায়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। টিভির 'সংবাদ' ও সমালোচকদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্যেই প্রথম পদক্ষেপ হলো: জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা। এটা সফল হলে আরও কিছু পদক্ষেপ হয়তো সরকার নেবে। এভাবে বর্তমান সরকার অনেকটা 'বাকশাল' স্টাইলে 'এক নেতা এক দেশ' ধরনের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নিয়ে এগুচ্ছে।

কাজেই জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা আপাতদৃষ্টিতে সম্প্রচার বিষয়ক মনে হলেও এটা সরকারের একটা রাজনৈতিক পরিকল্পনা। এর সারকথা হলো: দেশে শুধু সমর্থক, বশংবদ, স্তুতিকার ও অনুগ্রহভোগীরা থাকবে। স্বাধীন কণ্ঠ বলে কিছু থাকতে পারবে না।

কিন্তু সরকারের প্রথম পদক্ষেপটি এভাবে সমালোচিত হবে তা সরকার হয়তো ভাবতে পারেনি। তথ্যমন্ত্রী নীতিমালাটি নিয়ে লেজেগোবরে করে ফেলেছেন। এখন ব্যাপক সমালোচনার মুখে তিনি পিছু হটছেন। এখন বলছেন: 'এটা নিছক নীতিমালা, কোনো আইন নয়। এটা মানার বাধ্যবাধকতা নেই। এটার ভিত্তিতে যে আইন হবে সেটাই হবে বাধ্যতামূলক। এখন যারা এই নীতিমালার সমালোচনা করছেন তারা আইন প্রণয়নের সময় এই দুর্বলতাগুলো দেখিয়ে দিতে পারবেন। তখন সংশোধন করা হবে।' (উদ্ধৃতি নয়)

নীতিমালার আরও বিভিন্ন ধারা নিয়ে যেসব সমালোচনা হয়েছে তিনি তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। ব্যাখ্যাগুলো ইতিবাচক। কিন্তু প্রশ্ন তোলা যায় সেই ব্যাখ্যাগুলো নীতিমালায় থাকলে অসুবিধে কী ছিল? এখন তথ্যমন্ত্রী যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তা কি নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে? নাকি তা নিছক গণমাধ্যমের খোরাক হিসেবেই থেকে যাবে? এই দিকটা স্পষ্ট নয়। আমরা দাবি করবো সমালোচনার প্রত্যুত্তরে তথ্যমন্ত্রী যেসব ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা মূল নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হোক। এটা না করা হলে তথ্যমন্ত্রীয় এই ব্যাখ্যার কোনো মূল্য থাকবে না। তা দলিলে পরিণত হবে না।

সম্প্রচার আইন

তথ্যমন্ত্রী বলেছেন: এক মাসের মধ্যে সম্প্রচার আইন তৈরির জন্যে একটি কমিটি করবেন। আমরা তাঁর এই ঘোষণাকে স্বাগত জানাই। আমরা আশা করবো আইন ও গণমাধ্যম বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হবে। আইন প্রণয়ন কমিটির কাছে বর্তমান নীতিমালাটি গাইডলাইন হিসেবে দেয়া হলে তা ঠিক কাজ হবে না। কারণ নীতিমালার বহু ধারা ত্রুটিপূর্ণ ও অস্পষ্ট। এই নীতিমালা দিয়ে আইন প্রণয়ন কমিটি ভুলভাবে পরিচালিত হতে পারে। এই নীতিমালায় তথ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ব্যাখ্যাগুলো এখনো সংযোজিত হয়নি। আমরা দাবি করবো: বর্তমান নীতিমালাটি সংশোধন ও সম্পাদনা করে একটি দর্শক বান্ধব নীতিমালা করে আইন প্রণয়ন কমিটির কাছে দেয়া হোক। তাহলে আইন প্রণয়ন কমিটি আর বিভ্রান্ত হবেনা। যদি তা করা না হয় তাহলে আইনের প্রথম খসড়া আবার অহেতুক সমালোচনার জন্ম দিতে পারে। তাতে অনেক সময় অপচয় হবে।

সম্প্রচার আইনের প্রথম খসড়াটি প্রকাশ করার আগেই অংশীজন ও নির্বাচিত বিশেষজ্ঞদের মতামত নিলে ভালো হবে। এই মতামতের ভিত্তিতেই প্রথম খসড়া সরকার প্রকাশ করতে পারে বৃহত্তর পরিধিতে মতামত গ্রহণের জন্যেও। তবে মূল নীতিমালাটি সংশোধিত না হলে আইনেও নানা সমস্যা থাকা স্বাভাবিক। এই বিষয়টির প্রতি তথ্য মন্ত্রণালয়ের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জাতীয় সম্প্রচার কমিশন

তথ্যমন্ত্রী বার বার বলেছেন, 'সম্প্রচার কমিশন' গঠনের অর্থ হলো: সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় দায়িত্ব তথ্য মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে কমিশনকে দিয়ে দেয়া।' এটা খুবই বলিষ্ঠ একটি সিদ্ধান্ত। যদি তা সত্যি সত্যি বাস্তবায়িত হয়, যদি আমরা বাস্তবে তা দেখতে পাই তাহলে বর্তমান তথ্যমন্ত্রী ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কিন্তু আমাদের দুষিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির কারণে এটা হয়তো সম্ভব হবে না। কারণ: ১) আমাদের দেশে কেউ ক্ষমতা ছাড়তে চায় না। ২) কোনো কমিশনের প্রকৃত স্বাধীনতা সরকার অনুমোদন করে না। আসলে বাংলাদেশে 'সরকারই' একমাত্র স্বাধীন। কাজেই আমাদের আশঙ্কা এই কমিশনও স্বাধীন হবে না। এই কমিশনে ভুল লোক নিয়োগ দিলে তাঁরা তথ্য মন্ত্রণালয়ের চাইতেও সরকার ঘেঁষা ও রক্ষণশীল হতে পারে। তবে আমরা আশাবাদী হতে চাই। আশা করি, সম্প্রচার কমিশনে উপযুক্ত লোক নিয়োগ পাবেন ও তাঁরা স্বাধীনতার চর্চা করবেন।

সম্প্রচার নীতিমালায় বলা হয়েছে, একটি 'সার্চ কমিটি' সম্প্রচার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নাম প্রস্তাব করবে। কমিশন কত সদস্যের হবে তা স্পষ্ট নয়। তবে সার্চ কমিটির সদস্য কারা হবেন (পেশা) তা নীতিমালায় আভাস দেয়া হয়েছে। সার্চ কমিটি সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা ভালো নয়। সার্চ কমিটির মাধ্যমেই বর্তমান বিতর্কিত নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। তাঁদের কীর্তিকলাপ তো আমরা দেখছি। তাছাড়া সার্চ কমিটিতে সরকার বা দলঘেঁষা ব্যক্তিরাই যে মনোনয়ন পাবেন না তার নিশ্চয়তা কী? দলদাস ব্যক্তিরা তো সরকার পছন্দ ব্যক্তিদের নামই প্রস্তাব করবে। সরকার ঘেঁষা ব্যক্তিরা কি স্বাধীন কমিশন পরিচালনা করতে পারবেন? কাজেই সার্চ কমিটি দিয়ে ঠিক কাজটি হবে বলে মনে হয় না।

আমাদের একটি বিকল্প প্রস্তাব আছে। সরকার প্রধান অংশীজন (এ্যাটকো), জাতীয়ভিত্তিক বিভিন্ন পেশাজীবী ফোরাম, (অন্তত ১০টি) সক্রিয় নাগরিক ফোরাম (অন্তত ৫টি) এদেরকে ১ জন চেয়ারম্যান ও ১০ জন সদস্যের নাম প্রস্তাব করার দায়িত্ব দিতে পারেন। সদস্যদের যোগ্যতার মাপকাঠিও বলে দিতে হবে। যাঁদের নাম প্রত্যেক তালিকায় কমন হবে তাঁদেরকেই সরকার সম্প্রচার কমিশনে মনোনয়ন দিতে পারেন। এই প্রক্রিয়ায় তথ্য মন্ত্রণালয় জানতে পারবেন কমন নামগুলোর প্রতি বহু লোকের আস্থা রয়েছে। সার্চ কমিটিতে শুধু সদস্যদের (১০ জন?) মতামত পাওয়া যায়। আর এই পদ্ধতিতে অন্তত দুইশ' জন বিশিষ্ট ব্যক্তির পরোক্ষ মতামত পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি ফোরাম তাদের নির্বাহী কমিটির সভা করে আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে নামগুলো প্রস্তাব করবে।

সম্প্রচার কমিশনের সদস্যদের যোগ্যতার মাপকাঠিও খুব স্পষ্ট করতে হবে। তা না হলে অহেতুক ভুল নাম প্রস্তাব হতে পারে। যোগ্যতার কিছু নমুনা: ১) তিনি কোনো সরকার বা দলের সদস্য বা সক্রিয় সমর্থক হতে পারবেন না, ২) তিনি কোনো মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি হতে পারবেন না, ৩) তিনি বর্তমান সরকারের কোনো প্রকল্প বা কর্মসূচি বা ব্যবসার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকতে পারবেন না, ৪) তিনি সম্প্রচার ব্যবসার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকতে পারবেন না, ৫) আইন বা গণমাধ্যম বা নাগরিক ইস্যুতে তাঁর কোনো সক্রিয় ভূমিকা থাকতে হবে, ৬) সাধারণভাবে তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবেন ইত্যাদি। আরও গুণাবলী চিহ্নিত করা যায়, তবে তা বাস্তবসম্মত হতে হবে। সম্প্রচার কমিশনকে সত্যিকার অর্থে স্বাধীন হতে হলে এর চেয়ারম্যান ও সদস্য মনোনয়ন খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবে বাংলাদেশে দল নিরপেক্ষ স্বাধীন ব্যক্তিরা সরকারের কাছে আদৃত হয় না, এই বাস্তবতাও মনে রাখতে হবে।

আরও একটি বিষয়ের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্যে পৃথক 'সম্প্রচার কমিশন' গঠন না করে বর্তমান প্রেস কাউন্সিলকে ঢেলে সাজিয়ে 'মিডিয়া কাউন্সিল' করার যে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে তাও বিবেচনার দাবি রাখে। কিছু ট্যাকনিক্যাল দিক ছাড়া সব গণমাধ্যমের মূল চরিত্র ও কাজ এক। কাজেই একই প্রতিষ্ঠানের দুটি বিভাগ বা দুটি জুরি বোর্ড থাকতে পারে। সামগ্রিক গণমাধ্যম একই আইনের অধীনে পরিচালনা করা যায়। সেক্ষেত্রে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্যে একই নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন করা যায়। সংবাদপত্রের জন্যে বর্তমানে একটি আইন রয়েছে। সেটার সঙ্গে কিছু আইন সংযোজন করে 'গণমাধ্যম বিষয়ক সামগ্রিক আইন' প্রণয়ন করলে সবচেয়ে ভালো হবে। এমন আইন, যা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে, গণমাধ্যমকে দায়িত্বশীল হতে সহায়তা করবে, পেশাদারি হতে সহায়তা করবে। আইনের ব্যত্যয় হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ারও বিধান থাকতে হবে।

আশা করি, গণমাধ্যম বিষয়ক আইন ও স্বাধীন সম্প্রচার বা মিডিয়া কমিশন গঠন করা হলে আমাদের গণমাধ্যম জগতে গুণগত পরিবর্তন আসবে। গণমাধ্যমের সবকটি শাখা যার যার বৈশিষ্ট অনুযায়ী বিকশিত হতে পারবে। ■

লেখক: মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, মিডিয়া ও উন্নয়নকর্মী এবং সদস্য- জাতীয় কমিটি, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক।

.....

২১ আগস্ট ২০১৪ 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনায় মূল প্রবন্ধ হিসেবে উপস্থাপিত।